হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি

গোলাম মুরশিদ

ইংরেজ শাসনের প্রভাব

বাংলা ভাষার বিকাশ

গভর্নর জেনারেল ওয়েলসলি ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছিলেন, আগেই তা উল্লেখ করেছি। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং সংবাদপত্রের মতো এই কলেজও পরোক্ষভাবে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিরাট অবদান রেখেছিল। তখন কোম্পানির যে তরুণ কর্মচারীরা আসতেন, তাঁরা ভারতবর্ষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল ইত্যাদি-এক কথায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। ভালো শাসক হওয়ার পথে এটা ছিল একটা মস্ত বাধা। এই বাধা দূর করার জন্যই কোম্পানি এই কলেজ স্থাপন করেছিল। কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল, কাজ শুরু করার আগে এই কলেজে লেখাপড়া শিখে এই কর্মচারীরা যাতে ভারতবর্ষ এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। কিন্তু কোম্পানির আসল লক্ষ্য যা-ই হোক, বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এই কলেজ থেকে পরোক্ষ সুফল হয়েছিল অনেক। তার মধ্যে একটা হলো কলেজের ছাত্রদের জন্য দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল এই কলেজ থেকে।

আগেই বলেছি, এসব বইয়ের মধ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকও ছিল। এই বাংলা বইগুলো রচিত হয়েছিল উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে। তিনি নিজে বাংলা জানতেন, তবে কতটা জানতেন সে বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তাঁর ছিল অন্তহীন উৎসাহ এবং কাজ করার ক্ষমতা। বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বে তাঁর সত্যিকার আকর্ষণ ছিল এবং পরে অধিকারও জন্মে ছিল। তিনি কলেজের বাংলা বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষার জন্য তা ভালো ফল দিয়েছিল। এমন কি দেশীয় অন্যান্য ভাষার জন্যও তা ভালো হয়েছিল।

কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উপযুক্ত কোনো লোক গভর্নর জেনারেল খুঁজে পাননি। তত দিনে হেনরি পিটস ফরস্টারের অনূদিত বাংলা আইনের সাত-আটটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলো তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা-ইরেজি অভিধানের প্রথম খণ্ড। বলতে গেলে এই অভিধানই ছিল প্রথম সত্যিকারের বাংলা-ইংরেজি অভিধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত করেননি। কারণ ফরস্টার যে উপদলের সদস্য ছিলেন, সে উপদলের নেতা ছিলেন রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জর্জ গ্র্যাহাম। এবং সে উপদলের সঙ্গে গভর্নর জেনারেলের বিশেষ শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। তাই গভর্নর জেনারেল ওয়েলসলি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বুকাননের মাধ্যমে কেরিকে এই পদ নেওয়ার আহ্বান জানান, যদিও ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক ছিল বিরোধিতার। তা ছাড়া তত দিনে গসপেলের একটি দুর্বল এবং ছয়টি অনুবাদ ছাড়া কেরি বাংলাতে অন্য কিছু প্রকাশ করেননি। তাঁর বাংলা জ্ঞান নিয়েই সন্দেহ ছিল। তা সত্ত্বেও ফরস্টারকে বাদ দিয়ে কেরিকেই বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এটাকে বৈষম্যমূলক আচরণই বলতে হয়। তবে স্বীকার করতে হবে যে, কেরির নিয়োগই বাংলা এবং দেশীয় ভাষাগুলোর জন্য ভালো হয়েছিল। কারণ কেরির অন্তহীন উৎসাহ, ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা ফরস্টারের ছিল না।

বাংলা গদ্যের বিকাশে কেরির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর সাংগঠিক ক্ষমতার জন্যই। নিজে কী লিখেছিলেন, তার চেয়েও তাঁর বেশি অবদান-তিনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্যান্য ভাষা-বিভাগের মতো, তাঁর অধীনে বেশ কয়েকজন মুনশি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত রামরাম

বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এই মুনশিরা কেউ চিঠি লেখার নমুনা, কেউ ইতিহাস, কেউ গল্পের বই লিখে তার মাধ্যমে কোম্পানির তরুণ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেরি নিজে সংগ্রহ করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে বলা যায় এমন কথ্য বাংলার একটি সংকলন। তা ছাড়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সহায়তা নিয়ে লিখেছিলেন হ্যালহেডের আদলে একটি বাংলা ব্যাকরণ। এসব বই ছাপা হতো মাত্র কয়েক শ করে। পড়তও কেবল ইংরেজ কর্মচারীরা। কিন্তু এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলা গদ্য কোন স্টাইলে লেখা হবে, তার দিক-নির্দেশ করেছিলেন তাঁরা।

আঠারো শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত যে বাংলা গদ্য প্রচলিত ছিল, তা ছিল আরবি-ফার্সি শব্দপ্রধান। বাক্যগুলো ছিল ছোট এবং সরল। কিন্তু এই শতকের শেষ দশকে আইনের বই অনুবাদ করাতে গিয়ে হেনরি পিটস ফরস্টার তাঁর মুনশিদের সংস্কৃত-প্রধান রীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। ফলে জমিদারের মতো বহুল ব্যবহৃত শব্দও 'ভূম্যধিকারী'তে পরিণত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুনশিরা, বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কেরির নেতৃত্বে এই রীতিকেই আরো জোরদার করেন।

কেরি নিজেও মৃত্যুঞ্জয়ের স্টাইল দিয়ে প্রভাবিত হন। গোড়ার দিকে তাঁর ওপর ফার্সি-নবিশ রামরাম বসুর প্রভাব ছিল। কলকাতায় আসার পর কেরি তাঁকেই নিজের মুনশি নিয়োগ করেছিলেন। তার আগে টমাসের মুনশিও ছিলেন রামরাম বসু। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়েই ছাত্রদের ভাষা শিক্ষার কথা মনে রেখে কেরি যে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, তাতে সংস্কৃত-প্রধান সাধু ভাষার প্রতি তাঁর অত প্রবল সমর্থন দেখা যায় না। এমন কি আরবি-ফার্সি শব্দের প্রতিও তখন তাঁর কোনো আক্রোশ ছিল না। কিন্তু ১৮০৫ সালে তাঁর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃত-প্রধান ভঙ্গি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্করণে আরবি-ফার্সি শব্দপ্রধান স্টাইলকে তিনি বাংলা ভাষার শুদ্ধ এবং সুন্দর রীতির বিকার বলে উল্লেখ করেন। কেবল বাংলা গদ্যের দিক-নির্দেশনা নয়, আগেই লক্ষ্য করেছি, বাংলা ছাপায়ও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৮১২ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেস থেকে কলেজের অনেকগুলো বাংলা (এবং অন্যান্য ভাষার) পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছিল। এর ফলে কেবল বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি, বাংলা মুদ্রণেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেসব পাঠ্যপুস্তক তৈরি হয় তা অন্য ভারতীয় ভাষাগুলোর গদ্যসাহিত্য গড়ে উঠতেও সাহায্য করেছিল। তা ছাড়া ছাপাখানার যে নতুন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তারও একটা বড় দান রয়েছে বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বিকাশে। এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠার আগে ভারতীয় শিক্ষিত মানুষের কাছে কোনো বই-ই সহজলভ্য ছিল না। কারণ হাতে লেখা বইগুলোর বেশি কপি থাকত না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই বই সংগ্রহ করা অথবা তা পড়াও খুব শক্ত ব্যাপার ছিল। কিন্তু ছাপাখানা চালু হওয়ার পর হাজার হাজার বই ছাপা শুরু হলো। এর ফলে মানুষের পক্ষে শিক্ষা লাভ করা অথবা লেখকদের পক্ষে তাঁদের মতামত প্রকাশ করা-উভয়ই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই ছাপাখানার দৌলতে সাধারণ লোকেরা ভাষার একটা আদর্শ নমুনাও দেখতে পেলেন। কিন্তু এই যে মুদ্রণের নতুন ঐতিহ্য গড়ে উঠল, তার পেছনে পাঠ্যপুস্তকের অসামান্য অবদান রয়েছে। এই পথ ধরেই অতঃপর রামমোহন এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা বই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত, আরো বলা যেতে পারে যে, পাঠ্যপুস্তক ছাপানো তখন একটা লাভজনক কাজ বলে বিবেচিত হয়। সে কারণে উনিশ শতকের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকরাও কেউ কেউ ছাপাখানা খুলেছিলেন। যেমন- গিলক্রিস্ট খুলেছিলেন একটি হিন্দুস্তানি ছাপাখানা, লামসডেন খুলেছিলেন ফার্সি ছাপাখানা, আর কোলব্রুক সংস্কৃত ছাপাখানা। দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ছাপাখানা স্থাপনের কৃতিত্ব লালু প্রসাদের, ১৮০৭ সালে। তিনিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এভাবে কলকাতায় এশিয়ার সবচেয়ে বড় ছাপার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে।

একবার ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা পত্রিকার প্রকাশও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কেবল কখন প্রকাশিত হবে- সেটাই ছিল প্রশ্নের ব্যাপার। সেই পত্রিকা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় হিকির *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হওয়ার ৩৮ বছর পরে। কিন্তু সে পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্বও ইংরেজদের প্রাপ্য। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে *দিগ্‌দর্শন* নামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তার পরের মাসেই তাঁরা প্রকাশ করেন একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-*সমাচার-দর্পণ*। সেই পত্রিকা টিকে ছিল দীর্ঘদিন। খবর পরিবেশন ছাড়াও শ্রীরামপুরের মিশনারিদের পত্রিকা প্রকাশের একটা উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করা এবং হিন্দু (ও ইসলাম) ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্ট ধর্ম কত শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করা।

দেশীয়রা তাঁদের ধর্মের ওপর মিশনারিদের এই আক্রমণকে স্বভাবতই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। সে জন্য মিশনারিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও একাধিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যাঁরা এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের একজন রামমোহন রায়। তিনি যেহেতু উদারনৈতিকতা এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, সে জন্য তিনি একই সঙ্গে খ্রিষ্টান এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের সমালোচনা করেছিলেন। এমন কি মুসলমানদের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। আবার *সমাচারচন্দ্রিকা*র মতো রক্ষণশীল হিন্দুদের পত্রিকায় একই সঙ্গে খ্রিষ্টানদের এবং রামমোহনের সমালোচনা করা হতো। এভাবে পত্রিকাগুলোর ত্রিমুখী লড়াইতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল বাংলা গদ্য। পাঠ্যপুস্তকের আড়ষ্ট বাংলা গদ্য এ সময়ে এক ধরনের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, যা তার আগে পর্যন্ত ছিল না।

ghulammurshid@aol.com